ইউনিট- ১৫

ফুল ও ফলের শারীরতত্ত্ব

সমস্ত উদ্ভিদ জগতকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। এর একটি হলো অপুষ্পক উদ্ভিদ এবং অপরটি হলো পুষ্পক উদ্ভিদ। শৈবাল, ছত্রাক, মস, ফার্ণ এ গুলো অপুষ্পক উদ্ভিদের উদাহরণ। আম, জাম, লিচু, কলা, কাঁঠাল, সরিষা, সূর্যমুখী, কালোমেঘ, ধান, পাট, চা এ গুলো পুষ্পক উদ্ভিদের উদাহরণ। এসব উদ্ভিদের বংশ বৃদ্ধির প্রধান উপায় হলো বীজ। আবৃতবীজী উদ্ভিদে ফলের অভ্যন্তরে বীজ সৃষ্টি হয়। আবার ফল এবং বীজ সৃষ্টি হয় ফুল হতে। অর্থাৎ ফুল সৃষ্টি হয় বলেই আমরা ফল এবং বীজ পাই। কাজেই দেখা যায় এসব উদ্ভিদের বংশ পরম্পরায় টিকে থাকা এবং সংখ্যা বৃদ্ধি উভয়ই ফুল ধারণের উপর নির্ভরশীল।

বীজ থেকে চারা হয়, চারা ক্রমে বড় হয় এবং পরিণত বয়স হলে ফুল ধরে। বীজ লাগানোর পর গাছে ফুল ধরতে বেশ সময়ের প্রয়োজন হয়। গাছে ফুল ধরার জন্য বহু শারীরতাত্ত্বিক পরিবর্তন ও প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। আবার গাছের ফুল ধরলেই ফল এবং বীজ হয় না। এর পিছনেও পরিণত হয়ে পাকা পর্যন্ত অনেক শারীরতাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটে থাকে। ফুল, ফল এগুলো হলো ঘটনা। এগুলোই আমরা সচরাচর দেখে থাকি। কিন্তু ঘটনার আড়ালে যে ঘটনা অর্থাৎ শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া সমূহ, এ গুলো আমারা সাধারণত দেখে থাকি না। এ ইউনিটের প্রধান উদ্দেশ্যেই হলো ঘটনার আড়ালের ঘটনা জানানো অর্থাৎ ফুল, ফল ও বীজ সৃষ্টির শারীরতাত্ত্বিক দিক উন্মচন করা।

পাঠ- ১ ঃ উদ্ভিদে পুষ্পায়নের শারীরতত্ত্ব

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি—

- পুষ্পায়নের শারীরতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ফ্লোরিজেন কি তা বলতে পারবেন।
- ফাইটোক্রোম রঞ্জক কি উল্লেখ করতে পারবেন।
- পুষ্পায়নের ফাইটোক্রোম রঞ্জকের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।
- পুষ্পায়নের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

যেসব উদ্ভিদে ফুল ধরে সে সব উদ্ভিদকে বলা হয় পুষ্পক উদ্ভিদ। আর পুষ্পক উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পুষ্পায়ন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিণত বয়সে উপযুক্ত সময়ে গাছে পুষ্প সৃষ্টি হওয়ার প্রক্রিয়াকে বলা হয় পুষ্পায়ন। পুষ্পায়নের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় ফল এবং বীজ।

কান্ডের স্বরূপ অনুযায়ী পুষ্পক উদ্ভিদ প্রধানত তিন ধরনের হয়, যথা বীরুৎ, গুল্ম এবং বৃক্ষ। এর মধ্যে বীরুৎ জাতীয় গাছে, বিশেষ করে বর্ষজীবী উদ্ভিদে বীজ থেকে চারা গজানোর ১/৩ মাসের মধ্যেই ফুল আসতে শুরু করে, কিন্তু গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদে বীজ থেকে চারা গজানোর পর সাধারণত এক বছরের আগে ফুল ধরা শুরু করে না। বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদে ফুল ধরতে সময় লাগে আরও অনেক বেশি, চার-পাঁচ বছর, এমনকি তারও বেশি। তবে গুল্ম ও বৃক্ষ জাতীয় গাছ গুলোতে একবার ফুল ধরতে শুরু করলে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রতি বছরই ফুল ধরে, যেমন- আম, জাম, লিচু ইত্যাদি। কাজেই দেখা যায় গাছে ফুল আসা শুরু হওয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বয়স হওয়া আবশ্যক, এবং এ বয়স গাছের স্বরূপ ও ধরন অনুয়ায়ী কম-বেশি হয়ে থাকে। সাধারণত বীরুৎ জাতীয় গাছে কম এবং বৃক্ষ জাতীয় গাছে বেশি। প্রতিটি উদ্ভিদে অঙ্গজ পর্যায় থেকে জনন পর্যায়ে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য এদের দেহাভ্যন্তরে বিশেষ শারীরতাত্ত্বিক পরিবর্তন সাধিত হয়। পুষ্পায়নের জন্য এ শারীরতাত্ত্বিক পরিবর্তন আবশ্যক। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অঙ্গজ বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় বয়স হওয়ার পর পুষ্পায়নের জন্য উদ্ভিদের দেহাভ্যন্তরে যে শারীরতাত্ত্বিক পরিবর্তন ও ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটে থাকে তাকে সামাগ্রিকভাবে পুষ্পায়নের শারীরতত্ত্ব বা ফিজিওলজি অব ফ্লাওয়ারিং বলা হয়।

প্রয়োজনীয় বয়স ও অঙ্গজ বৃদ্ধি হলে গাছে ফুল ধরে সত্যি কিন্তু বছরের কোন সময় ফুল আসবে অনেক ক্ষেত্রেই তা নির্ভর করে আলোক বা অন্ধকারের সময়কাল, তাপমাত্রা ইত্যাদি বিভিন্ন নিয়ামকের উপর। এ কারণেই বাংলাদেশে বিভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ফুল ফুটতে দেখি, যেমন- শীতের শেষে বসন্তের প্রথম প্রহরেই গাছে গাছে শোভা পায় পলাশ, শিমুল,

অশোক, গিরিমল্লিকা; বসন্তের শেষে বা গ্রীষ্মের প্রথমে দেখি রক্তরঙা কৃষ্ণচূড়া, বর্ষার ফুল হিসেবে পাই কদম, শরতে শিউলি, ইত্যাদি।

পুষ্পায়ন হরমোন ঃ ফ্লোরিজেন

প্রতিটি উদ্ভিদে ফুল সৃষ্টির জন্য একটি আবেশ সৃষ্টি হয়। এ পুষ্পায়ন আবেশ বা উদ্দিপনা বিশেষ কোন পদার্থ দিয়ে সৃষ্টি হয় বলে ধারণা করা হয় এবং এ উদ্দিপনা সৃষ্টিকারি পদার্থটি একটি রাসায়নিক পদার্থ হবে বলেই এখন ধরে নেয়া হচ্ছে। **কাইলাকিয়ান** (Cajlachjan, 1936) নামক একজন বিজ্ঞানী এ রাসায়নিক পদার্থের নাম দেন **ফ্লোরিজেন** (florigen) অর্থাৎ ফ্লোরিজেন হলো উদ্ভিদে পুষ্পায়নের আবেশ সৃষ্টিকারি রাসায়নিক পদার্থ যা উদ্ভিদের দেহাভ্যন্তরে উপযুক্ত বয়সে এবং উপযুক্ত সময়ে সৃষ্টি ও ক্রিয়াশীল হয়। এ ফ্লোরিজেন একটি হরমোন জাতীয় পদার্থ। পুষ্পায়নের আবেশ সৃষ্টিকারি পদার্থ তথা ফ্লোরিজেনের প্রকৃতি নিয়েও অনেক গবেষণা হয়েছে। এসব গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, সব উদ্ভিদে এ বিশেষ রাসায়নিক পদার্থটির প্রকৃতি একই রকম। যাইহোক, ফ্লোরিজেন নামক কোন রাসায়নিক পদার্থ এখনও কোন উদ্ভিদ থেকে পৃথক করা সম্ভব হয় নাই। সাম্প্রতিক কালের গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে ফ্লোরিজেন হরমোন ছাড়া ক্যালসিয়াম ও লৌহের আয়নও পুষ্পায়নে সহায়তা করে থাকে।

পুষ্পায়ন রঞ্জক ঃ ফাইটোক্রোম

ফাইটোক্রোম হলো এক ধরনের রঞ্জক (Pigment) পদার্থ। আসলে এটি ক্রোমোফোর প্রোসথেটিক গ্র□প *বিশিষ্ট এক প্রকার* প্রোটিন। ফাইটোক্রোম বিভিন্ন উদ্ভিদ থেকে পৃথক করা সম্ভব হয়েছে।

পুষ্পায়ণে ফাইটোক্রোম রঞ্জকের প্রভাব ঃ ফটোপিরিয়ডিক প্রক্রিয়ায় আলোক শোষণকারী রঞ্জক সম্বন্ধে Garner and Allard-ই বলে গেছেন। পরবর্তী সময়ে Borthwick, Hendricks প্রমুখ বিজ্ঞানীগণ এ রঞ্জক পদার্থের নাম দেন ফাইটোক্রোম (phytochrome)। তাঁরা পরীক্ষা করে দেখেন যে, সয়াবীন, চন্দ্রমল্লিকার মতো ছোটদিনের উদ্ভিদে অন্ধকার কালের মাঝখানে লাল আলো (red light) দিলে এদের ফুল ধরে না; পরে এদেরকে অতি লাল আলো (far red light) দিলে ফুল ধরে। বার্লির মতো বড়দিনের উদ্ভিদে এর উল্টোটি ঘটে। এই পরীক্ষণ থেকেই তারা ফাইটোক্রোম রঞ্জকের কথা উল্লেখ করেন।

ফাইটোক্রোম রঞ্জকটি সূর্যালোকের লাল এবং অতিলাল আলো শোষণ করে কিন্তু নীল আলো খুবই কম শোষণ করে। এর আলোক শোষণ অঞ্চল প্রোটিন অংশের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। মনে করা হয় উদ্ভিদে ফাইটোক্রোম দুটি অবস্থায় বিরাজ করে। একটি হল ফাইটোক্রোম P_{730} যা 730 mμ আলোক শোষণ করে; অন্যটি হল ফাইটোক্রোম P_{660} যা 660 mμ আলোক শোষণ করে। অবস্থা দুটি আন্ত পরিবর্তনশীল। প্রথমটি হল far-red($P_{fr.}$) শোষণকারী অবস্থা এবং দ্বিতীয়টি হল red($P_{r.}$) শোষণকারী অবস্থা।

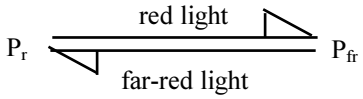

ফাইটোক্রোম তার আলোক শোষণ spectrum দিয়ে ক্লোরোফিল থেকে পার্থক্যমন্ডিত, কারণ ক্লোরোফিল নীল আলো বেশি শোষণ করে, ফাইটোক্রোম নীল আলো সবচেয়ে কম শোষণ করে। ফটোপিরিয়ড লম্বা হলে P_{730} অধিক সময় ধরে বিরাজ করে এবং বড় দিনের উদ্ভিদে পুষ্পায়নের সূচনা করে কিন্তু ছোট দিনের উদ্ভিদে পুষ্পায়নে বাধাদান করে। ফটোপিরিয়ড ছোট হলে P_{660} অধিক সময় ধরে বিরাজ করে এবং ছোট দিনের উদ্ভিদে পুষ্পায়নের সূচনা করে কিন্তু বড় দিনের উদ্ভিদে পুষ্পায়নে বাধাদান করে।

পুষ্পায়নের গুরুত্ব

পুষ্পায়ন অতিগুরুত্বপূর্ণ একটি প্রক্রিয়া। এর গুরুত্ব প্রধানত দু'ধরনের ১। পুষ্পক উদ্ভিদের জন্য এবং ২। মানবজাতি তথা প্রাণীকূলের জন্য।

১। পুষ্পক উদ্ভিদের জন্য ঃ পুষ্পক উদ্ভিদ বংশপরম্পরায় টিকে থাকে প্রধানত বীজের মাধ্যমে। আর বীজ সৃষ্টির অগ্রবর্তী ধাপ পুষ্পায়ন। পুষ্পায়ন ছাড়া ফল ও বীজ সৃষ্টি সম্ভব নয়। কাজেই বলা যায় পুষ্পক উদ্ভিদসমূহ পৃথিবীর বুকে বংশ

পরম্পরায় টিকে থাকে এবং বংশ বৃদ্ধি করে পুষ্পায়নের মাধ্যমে। পুষ্পায়ন না হলে পুষ্পক উদ্ভিদ সমূহ পৃথিবীর বুক থেকে বহু আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো।

২। মানবজাতির জন্য ঃ মানবজাতির জন্য পুষ্পায়নের গুরুত্ব সীমাহীন। পুষ্পায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা পেয়ে থাকি আমাদের প্রধান প্রধান খাদ্যদ্রব্য (ধান, গম, ভূট্টা, বার্লি, যব, চিনা, কাউন, খেজুর কলা ইত্যাদি), ও তেল জাতীয় খাদ্য। বস্ত্র উপকরণ (তুলা, শিমূল তুলা), ওষুধ (নাক্সভম), পানীয় (কফি), মশলা (জিরা, ধনে, লবঙ্গ, কালজিরা, মেথি ইত্যাদি) সবজি (বেগুন, ঢেঁড়স, শিম, বরবটি, ঝিঙ্গা, কাকরোল, করলা, চিচিঙ্গা, পটল, শসা, কুমড়া ইত্যাদি) প্রভৃতি। এছাড়াও পুষ্প এখন একটি লাভজনক ব্যবসায়িক উপকরণ, ভালবাসার বন্ধন, পৃথিবীতে স্বর্গীয় সুধা।

সার সংক্ষেপ

- পুষ্পায়নের জন্য উদ্ভিদের দেহাভ্যন্তরে সংঘটিত শারীরতাত্ত্বিক পরিবর্তন ও প্রক্রিয়াকে পুষ্পায়নের শারীরতত্ত্ব বলা হয়।
- উদ্ভিদে পুষ্পায়নের আবেশ সৃষ্টিকারি রাসায়নিক পদার্থের (হরমোন) নাম ফ্লোরিজেন।
- ফাইটোক্রোম হলো ক্রোমোফোর প্রোসথেটিক গ্র*প বিশিষ্ট এক প্রকার প্রোটিন যা সূর্*যালোকের লাল ও অতি লাল আলো অধিক মাত্রায় শোষণ করে পুষ্পায়নে প্রভাব বিস্তার করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। ফ্লোরিজেন কি রকম হরমোন?

ক. বৃদ্ধিকারক — খ. পুষ্পায়ন

গ. মূলসৃষ্টিকারী — ঘ. ফল পাকার

২। পুষ্পায়ন রঞ্জকের নাম কি?

ক. সাইটোক্রোম — খ. ফাইটোক্রোম

গ. ক্লোরোফিল — ঘ. জ্যান্থোফিল

৩। প্রথম ফুল আসতে সবচেয়ে কম সময় লাগে কোনটিতে?

ক. আম গাছে — খ. জাম গাছে

গ. লেবু গাছে — ঘ. ধান গাছে।

৪। বর্ষার ফুল কোনটি?

ক. কদম — খ. কৃষ্ণচূড়া

গ. পলাশ — ঘ. শিমুল

পাঠ- ২ ঃ পুষ্পায়নে অন্ধকার, আলো এবং নিম্নতাপমাত্রার প্রভাব

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি—

- ফটোপিরিয়ড কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ফটোপিরিয়ডিজম কি বলতে পারবেন।
- আলোর দীর্ঘতার (বা অন্ধাকারের খর্বতা) উপর ভিত্তি করে পুষ্পক উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ করতে পারবেন।
- বড় দিনের (ছোট রাত্রির) উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন।
- ছোট দিনের (বড় রাত্রির) উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য সনাক্ত করতে পারবেন।
- দিন নিরপেক্ষ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে পারবেন।
- পুষ্পায়নে নিম্নতাপমাত্রার প্রভাব আলোচনা করতে পারবেন।
- ভার্নালাইজেশন কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

এ পাঠকে দু'টো ভাগে ভাগ করে নেয়া যায়- ক) পুষ্পায়নে অন্ধকার ও আলোর প্রভাব এবং খ) পুষ্পায়নে নিম্নতাপমাত্রার প্রভাব।

ক) পুষ্পায়নে অন্ধকার ও আলোর প্রভাব ঃ উদ্ভিদে ফুল ধারণে আলোর প্রভাব লক্ষ্যনীয়। বিশেষ করে দিবালোকের স্থিতিকাল উদ্ভিদের পুষ্পায়ন নিয়ন্ত্রন করে বলে একসময় ধারণা করা হতো। পরবর্তী সময়ে পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে কেবল দিবালোকের স্থিতিকাল নয়, একই সাথে অন্ধকার কালের স্থিতিকালও এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। অর্থাৎ উদ্ভিদে পুষ্পায়নের জন্য আলো এবং অন্ধকার উভয় নিয়ামকেরই নিজ নিজ ভূমিকা রয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই একটির সাথে অপরটি সম্পর্কযুক্ত। স্বাভাবিক ভাবেই দিবালোকের দৈর্ঘ্য বেশি হলে রাত্রিকালীন দৈর্ঘ্য কম হবে, আবার দিবালোক দৈর্ঘ্য কম হলে রাত্রিকালীন দৈর্ঘ্য বেশি হবে। দিবালোক দৈর্ঘ্য কম-বেশি হওয়ার উপরও উদ্ভিদের পুষ্পায়নের সম্পর্ক রয়েছে।

ফটোপিরিয়ড (Photoperiod) ঃ Photo-অর্থ আলো; Period অর্থ সময়কাল; কাজেই ফটোপিরিয়ড অর্থ হল আলোর সময়কাল। প্রকৃত অর্থে দিবালোকের সময়কালকে (day light period) ফটোপিরিয়ড বলা হয়। দেখা গেছে উদ্ভিদের পুষ্পায়নের উপর ফটোপিরিয়ডের বেশ প্রভাব আছে। উদ্ভিদ শারীরতত্ত্বের ভাষায় ফটোপিরিয়ড হল কোন উদ্ভিদে পুষ্পধারণের জন্য উপযুক্ত দিবালোক দৈর্ঘ্য। বিভিন্ন উদ্ভিদের জন্য ফটোপিরিয়ড সাধারণত ভিন্নতর হয়ে থাকে।

ফটোপিরিয়ডিজম (Photoperiodism) ঃ দিন ও রাত্রিকালের তুলনামূলক দৈর্ঘ্যের প্রতি কোন উদ্ভিদের সাড়া দেয়ার প্রবণতাকে বলা হয় ফটোপিরিয়ডিজম। উদ্ভিদের ফুল ধারণের উপর দিনের আলোর স্থিতিকালের প্রভাব সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন Garner and Allard (1920)। তাঁরা লক্ষ্য করেন যে তামাকের Maryland Mammoth প্রকরণটিতে ফুল ধরে যখন রাত্রির অন্ধকার সময়কালের চেয়ে দিনের আলোর সময়কাল কম থাকে অর্থাৎ দিন ছোট ও রাত্রি বড় থাকে। Garner and Allard-ই ফটোপিরিয়ডিজম প্রক্রিয়ার প্রথম প্রবক্তা ও নামকারক।

দিবালোকের দীর্ঘতা ভিত্তিক পুষ্পক উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ ঃ আমরা জানি সারা বছর দিন ও রাতের দৈর্ঘ্য সমান থাকে না। কখনও দিন ছোট ও রাত বড়; আবার কখনও দিন বড় ও রাত ছোট থাকে। দিবাকালের দীর্ঘতার উপর ভিত্তি করে পুষ্পক উদ্ভিদকে তিনভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। ভাগ তিনটি হল–

১। ছোট দিনের উদ্ভিদ (Short-Day Plant) বা SDP
২। বড় দিনের উদ্ভিদ (Long-Day Plant) বা LDP
৩। নিরপেক্ষ দিনের উদ্ভিদ (Day Neutral Plant) বা DNP

১। ছোট দিনের উদ্ভিদ ঃ দিনের দৈর্ঘ্য কম হলে যেসব উদ্ভিদে ফুল ধরে সেসব উদ্ভিদকে বলা হয় ছোট দিনের উদ্ভিদ। দিন ছোট হলে রাত বড় হয় তথা অন্ধকার কাল বেশি থাকে। দেখা গেছে কোন ছোট দিনের উদ্ভিদে ফুল ধারণের জন্য ২৪ ঘন্টার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার সময়কালের প্রয়োজন। ঐ নির্দিষ্ট সময়সীমার চেয়ে অন্ধকারকাল কম থাকলে ঐ সব উদ্ভিদে ফুল ধরে না। এ নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার কালের মাঝখানে কিছুটা সময় আলো প্রদান করলে দেখা যায় ঐ সব উদ্ভিদে ফুল ধরে না। কাজেই ছোট দিনের উদ্ভিদকে সত্যিকার অর্থে বলা দরকার 'বড় রাত্রির উদ্ভিদ'। Hillman (1959) দেখান যে ছোট দিনের উদ্ভিদগুলিকে সুক্রোজ সরবরাহ করে এক নাগাড়ে অন্ধকারে রাখলেও ফুল ধরে। এ থেকে বুঝা

যায় এদের দিবালোকের দরকার কেবলমাত্র ফটোসিনথেসিস-এর জন্য, ফুল ধারণের জন্য নয়। ফুল ধারণের জন্য দরকার কেবলমাত্র অন্ধকারের।

সয়াবিন, আলু, ইক্ষু, কসমস, চন্দ্রমল্লিকা, অ্যাস্টার, ডালিয়া, তামাক, শিম এগুলিও ছোট দিনের উদ্ভিদ। রোপা আমন, পাট এগুলি ছোট দিনের উদ্ভিদ।

চিত্র ১৫.১ ঃ অন্ধকার কালের দৈর্ঘ্য ও উদ্ভিদের পুষ্পায়ন

২। বড় দিনের উদ্ভিদ ঃ রাতের অন্ধকারের চেয়ে দিনের দৈর্ঘ্য বেশি হলে যে সব উদ্ভিদে ফুল ধরে সেসব উদ্ভিদকে বলা হয় বড়দিনের উদ্ভিদ। উদ্ভিদের বিভিন্নতায় দিনের এ দৈর্ঘ্যকাল ১৪-১৮ ঘন্টা হতে পারে। ফুল ধারণের জন্য এসব উদ্ভিদের সংক্ষিপ্ত অন্ধকার কাল দরকার, এমনকি অন্ধকার কাল না হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে ফুল ধরে। বড়দিনের উদ্ভিদকে বড় রাত্রিকালে মাঝে মাঝে আলো প্রদান করলে এদেরও ফুল ধরতে পারে। কাজেই বড় দিনের উদ্ভিদকে 'ছোট রাতের উদ্ভিদ' বলা যায়। ফুল ধরার জন্য ২৪ ঘন্টার মধ্যে ১৮ ঘন্টাই দিবালোকের দরকার হয় এমন উদ্ভিদকে যদি পর্যায়ক্রমিক ভাবে ৮ ঘন্টা আলো এবং ৪ ঘন্টা অন্ধকারে রাখা হয়, তাহলেও এদের ফুল ধরে। এ থেকে বুঝা যায় বড় দিনের উদ্ভিদে আলো পাবার সময়য়ের চেয়ে অন্ধকারে থাকার সময়কাল বেশ কম হলেই ফুল ধরবে।
পালংশাক, লেটুস, আফিম, ভুট্টা, যব, ঝিঙা ইত্যাদি বড় দিনের উদ্ভিদ।

৩। নিরপেক্ষ দিনের উদ্ভিদ ঃ যে সব উদ্ভিদের ফুল ধারণের উপর দিন রাতের তুলনামূলক দৈর্ঘ্যের কোন প্রভাব নাই এরাই নিরপেক্ষ দিনের উদ্ভিদ। প্রয়োজনীয় দৈহিক বৃদ্ধি হলেই এদের ফুল ধরে। এদেরকে বছরের বিভিন্ন সময়ে জন্মানো যায়। টম্যাটো, শশা, কার্পাস, সূর্যমুখী, আউশ ধান ইত্যাদি নিরপেক্ষ দিনের উদ্ভিদ।

খ) পুষ্পায়নে নিম্নতাপমাত্রার প্রভাব ঃ পুষ্পায়নে আলো এবং অন্ধকারের মতো নিম্নতাপমাত্রার ও প্রভাব আছে। কোন কোন উদ্ভিদে নিম্ন তাপমাত্রা পুষ্পায়নে সহায়তা করে থাকে। ইউরোপীয় শীতকালীন গমের ক্ষেত্রে পুষ্পায়নে নিম্ন তাপমাত্রার প্রভাব প্রথম প্রমাণিত হয়। শীতকালীন গম শীতের প্রথমে বোনা হতো, কিন্তু তার বৃদ্ধি ও পুষ্পায়ন হতো বসন্তকালে। সেই গমকে বসন্ত কালে বুনে দেখা গেল গাছের ভাল বৃদ্ধি হয় কিন্তু ফুল ধরে না। রাশিয়ান বিজ্ঞানী লাইসেনকো (Lysenko) গমবীজকে নিম্নতাপমাত্রা প্রয়োগ করে বসন্তকালেই বপন করলেন, দেখা গেল তাতে ফুল ধরেছে। এ থেকেই প্রমাণিত হয়েছে যে কোন কোন উদ্ভিদে নিম্নতাপমাত্রা পুষ্পায়নে সহায়তা করে থাকে। বিজ্ঞানী লাইসেনকো পুষ্পায়নে নিম্ন

তাপমাত্রার প্রভাবকে নাম দিয়েছিলেন জেরোভিজেশন (Jarovization)। পরে একে ল্যাটিন ভাষায় ভার্নালাইজেশন (Vernalization) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। নিম্নতাপমাত্রায় পুষ্পায়নের ক্ষমতা অর্জনকে বলা হয় ভারনালাইজেশন।

পরীক্ষা করে জানা গিয়েছে যে নিম্ন তাপমাত্রার আবেশ (stimulus) গ্রহণ করে কান্ড শীর্ষের ভাজক কোষসমূহ। অনেকে মনে করেন নিম্ন তাপমাত্রার প্রভাবে কান্ড শীর্ষের ভাজক কোষ গুলোতে এক প্রকার হরমোন সৃষ্টি হয় যার ফলে পুষ্পায়ন ত্বরান্বিত হয়। কোন কোন বিজ্ঞানী (Melchers 1937) এ কাল্পনিক হরমোনকে **ভারনালিন** (Vernalin) নামে অবহিত করেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত ভারনালিন নামের কোন রাসায়নিক পদার্থ সনাক্ত করা সম্ভব হয় নাই।

সার সংক্ষেপ

ফটোপিরিয়ড- কোন উদ্ভিদে পুষ্পায়নের জন্য উপযুক্ত দিবালোক দৈর্ঘ্য।
ফটোপিরিয়ডিজম- দিন ও রাত্রিকালের তুলনামূলক দৈর্ঘ্যের প্রতি কোন উদ্ভিদের সাড়া দেয়ার প্রবণতা।
ছোট দিনের উদ্ভিদ- অন্ধকার পর্যায় বড় হলে এদের ফুল ধরে।
বড় দিনের উদ্ভিদ- অন্ধকার পর্যায় ছোট হলে এদের ফুল ধরে।
ভার্নালাইজেশন- নিম্ন তাপমাত্রায় উদ্ভিদের পুষ্পায়নের ক্ষমতা অর্জন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। ফটোপিরিয়ডিজম-এর প্রথম প্রবক্তা কে?
ক. Garner and Allard
খ. Garner
গ. Hillman
ঘ. Lysenko

২। দিবাকালের দীর্ঘতা ভিত্তিক উদ্ভিদ কত প্রকার?
ক. দুই প্রকার
খ. তিন প্রকার
গ. চার প্রকার
ঘ. সব উদ্ভিদ একই প্রকার

৩। চন্দ্রমল্লিকা কোন ধরনের উদ্ভিদ?
ক. ছোট দিনের
খ. মধ্যমদিনের
গ. বড় দিনের
ঘ. নিরপেক্ষ দিনের

৪। নিম্নতাপমাত্রায় পুষ্পায়নের ক্ষমতা অর্জনকে কি বলা হয়?
ক. নর্মালাইজেশন
খ. ক্রিস্টালাইজেশন
গ. ভারনালাইজেশন
ঘ. হর্মোনাইজেশন

পাঠ- ৩ ঃ ফল ও বীজ উৎপাদনের শারীরতত্ত্ব

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি—

- ফল ও বীজ উৎপাদনের পূর্বশর্ত কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ফল ও বীজ উৎপাদনের প্রভাবক গুলোর নাম বলতে পারবেন।
- ফাইটোহরমোনের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- অক্জিন কি, এর গাঠনিক সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
- অক্জিনের শারীরতত্ত্বিক প্রভাব উল্লেখ করতে পারবেন।
- ফল ও বীজ উৎপাদনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

আবৃতবীজী উদ্ভিদে ফল ও বীজ উৎপন্ন হয়। বীজ থাকে ফলের ভিতরে। ফল ও বীজ উৎপাদনের **পূর্বশর্ত হল নিষেকক্রিয়া।** সাধারণত নিষেক না ঘটলে ফুলটি ঝরে যায় কিন্তু নিষেক ঘটলে গর্ভাশয়টি ক্রমশ পরিপুষ্ট হয়ে ফলে পরিণত হয় এবং গর্ভাশয়ের ভিতরে অবস্থিত ডিম্বক পরিপূর্ণ হয়ে বীজ-এ পরিণত হয়।

ফল ও বীজ উৎপাদনের প্রভাবক

প্রায় সব শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়াতে কিছু প্রভাবক কাজ করে থাকে। ফল ও বীজ উৎপাদনের শারীরতত্ত্বেরও কিছু প্রভাবক আছে। প্রভাবকগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। অক্জিন (Auxins) ঃ ফল ও বীজ উৎপাদনে প্রধান ভূমিকা পালন করে অক্জিন। সার্থক পলিনেশনের পরপরই গর্ভাশয়ে অক্জিন তৈরি বেড়ে যায়। পরাগনালিকা যখন বাড়তে থাকে তখন পরাগনালিকা হতে একপ্রকার এনজাইম নিঃসৃত হয়, যার প্রভাবে ট্রিপটোপাফ্যান অক্জিন-এ পরিবর্তিত হয়। যাইহোক, পলিনেশন ও নিষেক-এর পর অক্জিন উৎপাদন বেড়ে যায়, ফলে গর্ভাশয়ের কোষ সৃষ্টি ও কোষ বৃদ্ধিকরণ (cell elongation) দ্রুত হয়; বোঁটায় অ্যাবসিশন (abscission) স্তর গঠিত হয় না। বোঁটায় অ্যাবসিশন স্তর গঠিত না হওয়ায় ফুলটি আর ঝরে যায় না, বরং তার পরবর্তী পরিবর্তন ও বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপাদান লাভ করতে থাকে।

২। খনিজ মৌল ঃ ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়াম, ফসফরাস ইত্যাদি খনিজ মৌল ফল ও বীজ পরিপুষ্টকরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। এদের ক্রিয়া কলাপ কোষ বিভাজন ও বৃদ্ধিকরণ বজায় রাখে, কার্বোহাইড্রেট প্রবাহ (পাতা থেকে ফ্লোয়েমের মাধ্যমে ফলে) সঠিক রাখে, ক্লোরোফিল ও সাইটোক্রোমের কার্যক্রম সঠিক রাখে। তবে এদের ভূমিকা ফল উৎপাদনে অক্জিন-এর মত সরাসরি নয়, পরোক্ষ।

৩। তাপ ঃ তাপও ফল উৎপাদনে বিশেষ ভূমিকা রেখে থাকে। অতি নিম্ন ও অতি উচ্চ তাপমাত্রায় অনেক ক্ষেত্রেই ফল উৎপন্ন হয় না। তাপমাত্রা বিভিন্ন এনজাইম ও হরমোন ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ফল উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে।

৪। পানি, CO_2 ও আলো ঃ ফল ও বীজে কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, প্রোটিন, বিভিন্ন খনিজ লবণ ইত্যাদি সঞ্চিত থাকে। এদের মূল উৎপাদক হল 'ফটোসিনথেসিস' প্রক্রিয়া। অক্জিন-এর প্রভাবে ফলের বোঁটায় অ্যাবসিশন স্তর সৃষ্টি হয় না। এর ফলে পাতায় তৈরি কার্বোহাইড্রেট সুক্রোজ হিসেবে বাহিত হয়ে ফল ও বীজে প্রবাহিত হয়। বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড বাহিত হয়ে ফল ও বীজে যায় এবং সুনির্দিষ্ট প্রোটিনে শৃ *খলিত হয়।* আলো, CO_2 ও পানি ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, তাই এগুলি পরোক্ষভাবে ফল উৎপাদনও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

যাইহোক, ফল ও বীজ উৎপাদনের প্রধান নিয়ন্ত্রক হল অক্জিন (auxin)। অক্জিন উৎপন্ন না হলে প্রথমাবস্থায়ই ফুলটি ঝরে যায়, কাজেই কোন ফল বা বীজ উৎপন্ন হয় না।

অক্জিন একটি ফাইটোহরমোন। উদ্ভিদ দেহে উৎপাদিত যে সব জৈব রাসায়নিক পদার্থ অতি অল্প ঘনত্বে বিদ্যমান থেকে উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে তাদেরকে **ফাইটোহরমোন** বলে। অক্জিন হল বৃদ্ধি বর্ধক হরমোন। গ্রীক auxein=to grow থেকে উদ্ভিদ বিজ্ঞানে auxin শব্দটির উদ্ভব হয়েছে। বিটপকে (shoot) দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি ঘটাতে পারে এমন পদার্থের গণ নাম হল অক্জিন। উদ্ভিদের প্রধান অক্জিন হল ইনডোল-৩ অ্যাসিটিক অ্যাসিড (IAA)। এছাড়া ইনডোল-৩ বিউটাইরিক অ্যাসিড, ইনডোল-৩ প্রোপায়োনিক অ্যাসিড এবং আরো অনেক সিনথেটিক অক্জিন আছে।

অক্জিন সবচেয়ে বেশি পরিমাণে বিদ্যমান থাকে বর্ধিষ্ণুশীর্ষ অঞ্চলে, যেএ- শীর্ষমুকুল। উদ্ভিদ দেহে ট্রিপটোফ্যান (tryptophan) থেকে IAA তৈরি হয়ে থাকে।

অক্জিনের শারীরবিজ্ঞানিক প্রভাব

১। অক্সিনের প্রভাবে কোষ দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি পায়।
২। অক্জিন উদ্ভিদ কর্তৃক অধিক পানি গ্রহণে সহায়তা করে।

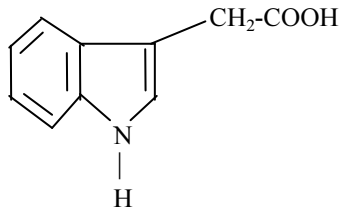

চিত্র ১৫.২ ঃ ইনডোল-৩-অ্যাসিটিক অ্যাসিড (IAA)

৩। অক্জিন শীর্ষমুকুলের বৃদ্ধিতে প্রাধান্য সৃষ্টি করে। একে শীর্ষ প্রাধান্য (apical dominace) বলে। শীর্ষ মুকুলে অক্জিন পরিমাণে বেশি থাকে তাই শীর্ষমুকুল অধিক বৃদ্ধি পেতে থাকে। শীর্ষ মুকুল অধিক বৃদ্ধি পেতে থাকায় পার্শ্বীয় কক্ষ মুকুলগুলির বৃদ্ধি খুব কম হয়। শীর্ষ মুকুল ভেঙ্গে দিলে অক্জিন নিচে প্রবাহিত হয় এবং নতুন পার্শ্বমুকুল সৃষ্টি ও এদের বৃদ্ধির ত্বরান্বিত হয়।

৪। অক্জিন মূল সৃষ্টি সূচনা করে। এতে মূলের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

৫। পরাগায়ন ও নিষেক ছাড়া ফল সৃষ্টিতে অক্জিন সহায়তা করে।

৬। অক্জিন শ্বসনের হার বৃদ্ধি করে।

৭। অক্সিনের প্রভাবে পাতা ও ফলের বোঁটায় অ্যাবসিশন স্তর সৃষ্টিতে বাধার সৃষ্টি হয়, তাই পাতা ও ফল ঝরে যায় না।

কোন গাছকে ঝোপ জাতীয় করতে চাইলে তার শাখা ছাটাই করতে হয়। শাখা ছাটাই করলে শীর্ষস্থ অক্জিন নিচে প্রবাহিত হয় এবং এর শীর্ষ প্রাধান্য নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে ছাটাই অঞ্চলের নিচ থেকে অসংখ্য মুকুল বের হয় এবং অসংখ্য নতুন শাখার সৃষ্টি হয়। এর ফলে গাছটি ঝোপ আকৃতির হয়। বৃক্ষ জাতীয় চা গাছকে ছাটাই করে ঝোপ আকারে রাখা হয়। ছাটাইকরণের ফলে অসংখ্য মুকুল সৃষ্টি হয়। আমরা মুকুলই সংগ্রহ করি। কারণ কচিপাতা ও মুকুল হতেই উৎকৃষ্ট চা পাওয়া যায়।

গাছের কলম সৃষ্টিকালে অক্জিন প্রয়োগ করে ভাল ফল পাওয়া যায়, কারণ অক্জিন নুতন মূল সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

পরাগায়নের অভাব হেতু কোন গাছে ফল সৃষ্টি না হলে অক্জিন প্রয়োগ করে পরাগায়ন ছাড়াই ফল সৃষ্টি করা যায়। এতে ফলে বীজ হয় না।

বীজ উৎপাদনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ঃ বীজ উৎপাদনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। এক কথায় বলতে গেলে আমাদের জীবনটাই নির্ভরশীল বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়ার উপর। বিষয়টিকে এভাবে দেখা যায়।

১। খাদ্যের উৎস ঃ আমাদের **কার্বোহাইড্রেট জাতীয়** খাদ্যের প্রধান উৎস হল ধান, গম, ভুট্টা, চিনা, কাউন, বজরা, বার্লি ইত্যাদি খাদ্য দানা। আমাদের তৈল জাতীয় খাদ্যের উৎস হল সরিষা, সয়াবিন, তিল, বাদাম, সূর্যমুখী, নারিকেল ইত্যাদি বীজ আর **প্রোটিন জাতীয়** খাদ্যের উৎস হল বিভিন্ন ডাল, বিভিন্ন বাদাম ইত্যাদি বীজ।

২। সবজি ঃ আমাদের অধিকাংশ সবজির (যেএ- লাউ, কুমড়া, ঝিঙা, চিচিঙ্গা, শসা, মূলা, ফুলকপি, বাধাকপি, বেগুন, ঢেড়শ, ডাটা, পেঁপে ইত্যাদি) চাষ হয় বীজের মাধ্যমে।

৩। অর্থকরি ফসল ঃ পাট, তুলা, তামাক, মরিচ ইত্যাদি অর্থকরী ফসলের চাষ হয় বীজের মাধ্যমে। মূলত আমাদের অধিকাংশ কৃষি উৎপাদন বীজ নির্ভর।

৪। ওষুধ ঃ নাক্সভম, ক্রোটন, চালমুগড়া ইত্যাদি বীজ হতে আমরা জীবন রক্ষাকারী ওষুধ পেয়ে থাকি।

৫। ব্যবসায়িক গুরুত্ব ঃ মানব জীবনে - প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, ওষুধ, পথ্য ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান সমূহের সরবরাহ ও চাষ বীজ নির্ভর। তাই বিভিন্ন শহর বন্দরে গড়ে উঠেছে অসংখ্যা বীজভান্ডার। এদের অনেকের ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ক আন্তদেশীয়।

ফল উৎপাদনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ঃ বীজ উৎপাদনের চেয়ে ফল উৎপাদনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব আরও বেশি, কারণ আবৃতবীজী উদ্ভিদে ফল উৎপাদন ছাড়া বীজ উৎপাদন অসম্ভব। বীজ উৎপন্ন হয় ফলেরই ভিতরে বীজহীন ফল উৎপাদন সম্ভব হলেও ফলহীন বীজ উৎপাদন কঠিন। ফল উৎপাদনের অর্থনৈতিক গুরুত্বকে নিম্নলিখিত উপায়ে উপস্থাপন করা যায়।

১। বীজ উৎপাদনের জন্য ঃ ফল উৎপাদনের প্রধান গুরুত্ব হল ফল উৎপাদনের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন।

২। খাদ্য উৎপাদন ঃ খাদ্য উপাদান হিসেবে ফলের গুরুত্ব অপরিসীম। ফল ভিটামিন ও খনিজ লবণের প্রধান উৎস। তাই দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় ফলের অন্তর্ভুক্তি সর্বজনস্বীকৃত ও আবশ্যক।

৩। একর প্রতি আয় ঃ ফলের বাজারমূল্য ও একর প্রতি আয় অপেক্ষাকৃত অধিক। এক একর জমিতে ধান বা পাট চাষ করে যে অর্থ আয় করা যায়, তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি অর্থ আয় করা যায় কলা, পেঁপে, লিচু, পেয়ারা ইত্যাদি ফল চাষ করে।

৪। পতিত জমি ব্যবহার ঃ পুকুর পাড়, রাস্তার পাশ, রেললাইনের পাশ, মাঠ ও ঘাটের কিনার ইত্যাদি জায়গায় যেখানে অন্য কোন ফসল করা সম্ভব হয় না, সেখানে অনায়াসে ফলের গাছ লাগানো যায়।

৫। স্থাবর সম্পত্তি ঃ ভাল ফলের বাগান একটি স্থাবর সম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত হয়। সামান্য যত্ন ও ব্যবস্থাপনার বিনিময়ে প্রতিবছর প্রচুর অর্থ উপার্জিত হয়।

৬। বৈদেশিক মুদ্রা আয় ঃ ফলের রস, সিরাপ, জেলী, জ্যাম, ইত্যাদি বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করা যায়।

৭। প্রধান খাদ্যের উপর চাপ কমানো ঃ নিয়মিত ফল খেলে যেমন স্বাস্থ্য ভাল থাকে, তেখনই ভাত, রুটি জাতীয় খাবারের উপর চাপ কমে যায়। এর ফলে দেশের খাদ্য ঘাটতি হ্রাস পায়।

সারসংক্ষেপ

- ফল ও বীজ উৎপাদনের পূর্বশর্ত হলো নিষেক ক্রিয়া।
- ফল ও বীজ উৎপাদনের প্রধান নিয়ন্ত্রক হলো অক্জিন।
- অক্জিন হলো একটি বৃদ্ধি বর্ধক হরমোন। একটি ফাইটোহরমোন।

পাঠোত্তর মূল্যালয়- ৩

সঠিক উত্তরে পাশে টিক চিহ্ন ($\surd$) দিন।

১। ফল ও বীজ উৎপাদনের পূর্বশর্ত হলো কি?

ক. নিষেকক্রিয়া | খ. রাসায়নিক বিক্রিয়া
গ. খনিজ মৌল সরবরাহ | ঘ. তাপ প্রয়োগ

২। কোনটি ফল ও বীজ উৎপাদনের মুখ্যভূমিকা পালন করে?

ক. পানি | খ. আলো
গ. তাপ | ঘ. অক্জিন

৩। অক্জিন কি?

ক. খনিজ লবণ | খ. পুষ্টি পদার্থ
গ. ফাইটোহরমোন | ঘ. এনজাইম

৪। উদ্ভিদ ছাঁটাই করলে কি হয়?

ক. দ্রুত উঁচু হয় | খ. ফুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়
গ. পত্র মুকুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় | ঘ. গাছ মরে যায়

পাঠ- ৪ ঃ ফল পাকার শারীরতত্ত্ব এবং বীজহীন ফল

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি—

- ফল পাকার শারীরত্বতীয় কারণগুলো নির্দেশ করতে পারবেন।
- ফল পাকলে মিষ্টি স্বাদ হয় কেন উল্লেখ করতে পারবেন।
- কাঁচা ফল টক হয় কেন তা বলতে পারবেন।
- ফল পাকলে হলুদ, কমলা বা লাল রং হয় কেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ফল পাকার অর্থনৈতিক গুরুত্ব লিখতে পারবেন।
- বীজহীন ফল কেন হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পারথেনোকার্পী কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।

পরাগায়ন ও নিষেকের পর ফুলের গর্ভাশয়টি ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে ফলে পরিণত হয়। উদ্ভিদবিজ্ঞানের ভাষায় ফল বলতে তাই ধান, গম, ভুট্টা, চিনাবাদাম, শিম, বরবটি, বেগুনসহ আম, জাম, লিচু, কলা, কাঁঠাল সবগুলিকেই বুঝায়। কিন্তু সাধারণভাবে ফল বলতে কেবল সেগুলিকেই বুঝায় যেগুলিকে রান্না না করে কাঁচা বা পাকা অবস্থায় খাওয়া হয়। আম, জাম, জামরুল, লিচু, কলা, কাঁঠাল, টম্যাটো, পেয়ারা, কুল, আপেল, আঙ্গুল, কমলা, আনারস, সফেদা ইত্যাদি ফলের উদাহরণ।

ফলগুলি ধীরে ধীরে বড় হয়ে পরিপূর্ণ আকার প্রাপ্ত হয় এবং পরে পাকতে শুরু করে। পরিণত ফলটির অভ্যন্তরে বিভিন্ন ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফলে ফলের রং, গন্ধ, স্বাদ, কাঠিন্যতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন সাধিত হয় এর ফলে ফলটি পেকেছে বলে আমরা ধরে থাকি। উদাহরণস্বরূপ কলার কথা বলা যায়। পরিণত কাঁচা কলার রং সবুজ, এর খোসা আলাদা করা যায় না, ভিতরে শক্ত ও কসযুক্ত, সুগন্ধহীন; কিন্তু পাকা কলার রং সাধারণত হলুদ, খোসা সহজেই আলাদা করা যায়; ভোজ্য অংশ নরম, মিষ্টি ও সুগন্ধযুক্ত হয়। এ গুলিই রাসায়নিক পরিবর্তনের ফল।

ফল পাকার শারীরতত্ত্বীয় কারণ

ফল পাকার ব্যাপারটি একটি গতিশীল সক্রিয় পদ্ধতি (dynamic active process)। এতে নিম্নরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়–

১. সঞ্চিত দ্রব্যের হাইড্রোলাইসিস (hydrolysis of stored materials);
২. পেকটিক পদার্থের নরমকরণ (softening of pectic substances);
৩. রং-এর পরিবর্তন (changes in pigmentation);
৪. সুগন্ধি দ্রব্যের পরিবর্তন (changes in flover component);
৫. শ্বসন ক্রিয়ার অবিশ্বাস্য পরিবর্তন (dramatic change in respiration) এবং
৬. অন্যান্য প্রাণ রাসায়নিক (biochemical) বিক্রিয়া।

১। সঞ্চিত দ্রব্যের হাইড্রোলাইসিস ঃ ফলে ভোজ্য অংশে সঞ্চিত থাকে প্রধানত কার্বোহাইড্রেট (স্টার্চ); বিভিন্ন জৈব অ্যাসিড, প্রোটিন, ফ্যাট ইত্যাদি। সঞ্চিত কার্বোহাইড্রেট হাইড্রোলাইসিস প্রক্রিয়ায় অপেক্ষাকৃত সরল দ্রব্যে পরিণত হয়। স্টার্চ থেকে ম্যালটোজ (maltose) হয়; সেলুলোজ থেকে সেলুবায়োজ (cellubiose) হয়; র‍্যাফিনোজ (raffinose) থেকে গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ এবং গ্যালাকটোজ হয়; সুক্রোজ (sucrose) থেকে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ হয়।

$$\text{Sucrose} + H_2O \xrightarrow[\text{Invertase}]{\text{ইনভার্টেজ}} \text{glucose} + \text{fructose}$$

$$\text{Starch}+H_2O \xrightarrow{\alpha \ \& \ \beta \ \text{amylases}} \text{maltose} \rightarrow \ \alpha\text{-D-glucose.}$$

জৈব অ্যাসিডসমূহ ক্রমান্বয়ে চিনিতে পরিবর্তিত হয়।

কাঁচা ফল টক হয় কেন? অনেক কাঁচা ফলে বিভিন্ন জৈব অ্যাসিড (অ্যাসকরবিক অ্যাসিড, ফরমিক অ্যাসিড, টারটারিক অ্যাসিড ইত্যাদি) থাকে। অ্যাসিড থাকার কারণে কাঁচা ফল টক হয়। অ্যাসিডের ধরন ও পরিমাণের উপর ফল কতটা টক হবে তা নির্ভর করে।

ফল পাকলে মিষ্টি হয় কেন? পাকা ফলে জৈব অ্যাসিডসমূহ চিনিতে পরিবর্তিত হয়। সঞ্চিত দ্রব্যের মধ্যে স্টার্চই (শ্বেতসার) প্রধান। স্টার্চ মিষ্টি নয়। ফল পাকলে স্টার্চ চিনিতে (সুক্রোজ এবং সুক্রোজ পরে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ-এ) পরিণত হয়। তাই ফল পাকলে মিষ্টি লাগে, কারণ গ্লুকোজও ফ্রুক্টোজের স্বাদ মিষ্টি।

২। পেকটিক পদার্থের নরমকরণ ঃ কাঁচা ফলের চেয়ে পাকা ফল নরম থাকে। পাকা কাঁঠালে চাপ দিলে হাত ফলে ঢুকে যায়। এটি কেন হয়? ফল পাকার সময় কোষের মধ্যস্তর (middle)-এর পেকটিক দ্রব্যের দ্রবণীয়তা বেড়ে যায়। পেকটোলাইটিক এজাইমের (pectolytic enzymes) কার্যকারিতায় পেকটিক দ্রব্যের লেগে থাকার গুণ (binding properties) হারায়। তাই পাকলে ফলের এক কোষ থেকে অন্যকোষ পৃথক হয়ে যায় এবং ফল নরম হয়ে যায়।

৩। রং-এর পরিবর্তন ঃ সবুজ রং-এর ফলটি পেকে হয় হলুদ, সবুজ টম্যাটো পেকে হয় লাল, এভাবে অনেক ফলেরই রং-পরিবর্তন হয়। ফলত্বক (খোসা) সাধারণত প্রথম থেকেই সবুজ থাকে, কারণ এতে থাকে প্রচুর ক্লোরোফিল। ক্লোরোফিল ছাড়াও এতে থাকে কম পরিমাণে ক্যারোটিন, জ্যানথোফিল। ফল পাকতে শুরু করলে নতুন করে ক্লোরোফিল তৈরি বন্ধ হয়ে যায়, এমনকি আগেরগুলিও নষ্ট হয়ে যায়। অন্যদিকে রঙিন ক্যারোটিন, জ্যান্থোফিলের পরিমাণ বাড়তে থাকে। এর ফলে সবুজ রং পরিবর্তন হয়ে হলুদ (ক্যারোটিন বেশি হলে) কমলা (জ্যানথোফিল বেশি হলে), লাল (লাইকোপিন বেশি হলে) ইত্যাদি বর্ণের হয়। পাকা কলার রং হলুদ হয় ক্যারোটিনের পরিমাণ বেড়ে যায় বলে। পাকা কমলার রং কমলা বর্নের হয় জ্যানথোফিলের পরিমাণ বেড়ে যায় বলে। পাকা টমেটোর রং লাল হয় লাইকোপিনের পরিমাণ বেড়ে যায় বলে।

ফল গাছ থেকে পেড়ে এনে ঘরে রাখলেও ক্লোরোফিল তৈরি বন্ধ হয়ে যায় এবং বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ফলের রং হলুদ, কমলা বা লাল হয়।

৪। সুগন্ধি দ্রব্যের সৃষ্টি ঃ কাঁচা ফলে সাধারণত কোন গন্ধ থাকে না। পাকা ফলে বিশেষ গন্ধের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন পাকা ফলের গন্ধ বিভিন্ন রকম হয় এবং না দেখে কেবল গন্ধ শুকেও কি ফল তা বলা যায়। পাকা আমের গন্ধ, বেলের গন্ধ, কাঁঠালের গন্ধ একটি থেকে অন্যটি পৃথক, কারণ এদের গন্ধ সৃষ্টিকারী পদার্থও ভিন্নতর। ফল পাকার সময় এর সঞ্চিত পদার্থে বিভিন্ন প্রাণ রাসায়নিক ক্রিয়া বিক্রিয়ার ফলে এসব গন্ধ সৃষ্টিকারী রাসায়নিক পদার্থের সৃষ্টি হয়।

৫। শ্বসন হার বৃদ্ধি ঃ ফল পাকতে শুরু করলে তাতে শ্বসন হার হঠাৎ করেই কয়েকগুন বৃদ্ধি পায়। আবার ফল পেকে গেলে তা বেশ কমে যায়। ফল পাকার শুরুতে শ্বসন হার হঠাৎ করে বেড়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে Kidd and West (1930) নাম দেন Climacteric rise। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী একে সংক্ষেপে Climacteric বলা হয়। একটি কাঁচা ফলকে পাকা ফলে পরিণত করতে যে সব পরিবর্তনের প্রয়োজন সব কিছুর উৎস (trigger) হল climacteric। বিজ্ঞানীগণ প্রমাণ করতে পেরেছেন যে ফল পাকার জন্য বিশেষভাবে ইথিলিন (ethylene) দায়ী। সাধারণ শারীরতাত্ত্বিক তাপমাত্রায় ইথিলিন একটি গ্যাস, যার আণবিক গঠন হল $CH_2=CH_2$। এটিকে একটি ফাইটোহরমোন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ইথিলিন প্ল্যান্ট

টিস্যুতে স্বল্প পরিমাণে তৈরি হয় এবং বিভিন্ন শারীরতাত্ত্বিক কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যান্য ফাইটোহরমোন থেকে এর পার্থক্য হল এটি প্ল্যান্ট টিস্যু থেকে দ্রুত ব্যাপিত (diffuse) হতে পারে। দেখা গেছে সব ফলেই সামান্য পরিমাণ ইথিলিন বিদ্যমান থাকে, কিন্তু Climacteric এর সময় বা তার ঠিক আগে ফলে ইথিলিন-এর পরিমাণ শতগুণ বেড়ে যায়। একটি পাকা ফল থেকে ইথিলিন ব্যাপিত হয়ে তার আশপাশে রাখা ফলে প্রবেশ করতে পারে এবং এদেরকে দ্রুত পাকতে সাহায্য করে থাকে।

কচি ফলে ইথিলিন প্রয়োগ করে তাকে পরিণত হওয়ার আগেই পাকানো যায়। নিম্নতাপমাত্রায় ইথিলিন তৈরি কমে যায়, তাই নিম্ন তাপমাত্রায় ফল সংরক্ষণ করলে পাকতে বিলম্ব হয়। ইথিলিন টিস্যুর ভেদ্যতা (permeability) বাড়িয়ে দেয় এবং ফল পাকার সব ধরনের প্রক্রিয়া শুরু করাতে ট্রিগার (trigger) হিসেবে কাজ করে।

বাজারে ইথিলিনের কয়েক প্রকার যৌগ পাওয়া যায়। এর মধ্যে ইথরেল (Ethral=2 chloro ethene phosphoric acid) উল্লেখযোগ্য। এর প্রয়োগে আম তাড়াতাড়ি পেকে যায়। উজ্জ্বল রং ধরে এবং পোকার আক্রমণও বন্ধ হয়। এর সাহায্যে অপক্ক বেলও পাকানো যায়।

ফল পাকানোর হরমোন হল **ইথিলিন;** ফলে ইথিলিনের পরিমাণ বাড়ার কারণেই তা পাকে।

ফল পাকার অর্থনৈতিক গুরুত্ব ঃ ফলের বিক্রয় মূল্য অনেকটা নির্ভর করে ফলের স্বাদ, ফলের গন্ধ, ফলের রং এবং কেমন পাকা তার উপর। ফলের স্বাদ, গন্ধ ও রং 'পাকা' প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়ে থাকে। অধিকাংশ ফলই পাকা অবস্থায় খাওয়া হয়, কাঁচা অবস্থায় এদেরকে খাওয়া যায় না। এ ধরনের ফলের সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক দিকটা এদের পাকার উপরই নির্ভর করছে। ফলের পুষ্টিমান, ভাইটামিন ও খনিজ লবণ ইত্যাদি ফল যথার্থ পাকার উপরই অনেকাংশে নির্ভরশীল।

বীজহীন ফল

আমাদের ভাল ফল গুলোর মধ্যে আম, জাম, লিচু, কলা, কাঁঠাল, বরই, কমলা, জাম্বুরা, বেল ইত্যাদি প্রধান। আমরা যখন এ সব ফল খাই, তখন এদের বীজ ফেলে দেই। ফলে বীজ ছোট থাকা, বা একেবারে না থাকার উপর এদের চাহিদা ও খাদ্যমান বৃদ্ধি পায়। বীজহীন ফলই আমাদের কাম্য।

১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে জাপানের কিহারা (Kihara) ও তাঁর সহকর্মীগণ বীজহীন তরমুজ উদ্ভাবন করেন। তাঁরা ডিপ্লয়েডকে টিপ্লয়েড-এ পরিণত করে একাজ করেন। বীজহীন তরমুজ বীজযুক্ত তরমুজ হতে উন্নত, দামী এবং অধিক চাহিদার। পলিপ্লয়ডির মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছে বীজহীন লেবু, কলা, আপেল প্রভৃতি।

পারথেনোকার্পী ঃ নিষেকক্রিয়ার পর গর্ভাশয়টি পরিপুষ্ট হয়ে ফলে পরিণত হয়। ফল উৎপাদনের এটিই সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম। কোন কোন ক্ষেত্রে নিষেক ছাড়াই গর্ভাশয় ফলে পরিণত হয়। নিষেক ছাড়া গর্ভাশয়ের ফলে পরিণত হওয়াকেই বলা হয় **পারথেনোকার্পী**। এরূপ ফলকে বলা হয় **পারথেনোকার্পিক ফল** (parthenocarpic fruits)। কলা এমন একটি ফল। নিষেক হয় না বলে এরূপ ফলে বীজ পুষ্ট হয় না। অক্জিন এবং জিব্বেরেলিন প্রয়োগ করে পারথেনোকার্পিক ফল সৃষ্টি করা যায়।

কলা পারথেনোকার্পিক উপায়ে সৃষ্ট হয় বলে এটি বীজহীন। বীজহীন হওয়ার কারণে এটি চাষ হয় দেশব্যাপী, বীচিকলার চাষ হয় না। বীচিকলার সাথে তুলনা করলেই বীজহীন কলার উন্নত মান ও ব্যাপক চাহিদা বুঝা যাবে। কলা প্রাকৃতিকভাবেই পারথেনোকার্পিক। দেখা গিয়েছে প্রাকৃতিকভাবে পারথেনোকার্পিক উপায়ে ফল সৃষ্টিকারী উদ্ভিদের গর্ভাশয়ে অনেক বেশি পরিমাণে অক্জিন বিরাজ করে, তাই পলিনেশনের উদ্দীপনা ছাড়াই গর্ভাশয় ফলে পরিণত হতে পারে।

সারসংক্ষেপ

- কাঁচা ফলে জৈব অ্যাসিড থাকলে কাঁচা ফল টক হয়। জৈব অ্যাসিডই টক হওয়ার কারণ।
- কাঁচা ফলে বিরাজমান জৈব অ্যাসিড ফল পাকার সময় চিনিতে পরিবর্তিত হয় বলে টক কাঁচা ফল পাকলে মিষ্টি হয়।
- ফল পাকতে শুরু করলে ক্লোরোফিল উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু একই সাথে ফলের ধরন অনুযায়ী ক্যারোটিন, জ্যান্থোফিল, লাইকোপিন ইত্যাদি রঙিন রঞ্জক গুলোর পরিমাণ বাড়তে থাকে। এর ফলে সবুজ বর্ণের ফল পাকলে রঙিন হয়।
- নিষেক ছাড়া গর্ভাশয় ফলে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে বলা হয় পারথেনোকার্পী এবং নিষেক ছাড়া সৃষ্ট ফলকে বলা হয় পারথেনোকার্পিক ফল।
- পারথেনোকার্পিক ফল বীজহীন হয়। পলিপ্লয়ডির মাধ্যমে বীজহীন ফল সৃষ্টিকরা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪

সঠিক উত্তরে পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। ফল পাকার হরমোন কোনটি?
ক. ইথিলিন	খ. অক্জিন
গ. জিবেরেলিন	ঘ. কাইনেটিন

২। পাকা ফলের ত্বক হলুদ হয় কেন?
ক. ক্লোরোফিল বেশি থাকে বলে	খ. ক্যারোটিন বেশি থাকে বলে,
গ. জ্যানথোফিল বেশি থাকে বলে	ঘ. লাইকোপিন বেশি থাকে বলে।

৩। পাকা ফল মিষ্টি হয় কেন?
ক. স্টার্চ বেশি থাকে বলে	খ. সেলুলোজ থাকে বলে,
গ. জৈব অ্যাসিড থাকে বলে	ঘ. গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ থাকে বলে।

৪। পারমোনোকার্পিক ফলের উদাহরণ কোনটি?
ক. কাঁঠাল	খ. আম
গ. জাম	ঘ. কলা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পুষ্পায়নের শারীরতত্ত্ব কি?
২. ফ্লোরিজেন বলতে কি বুঝ? কে এ নামকরণ করেন?
৩. ফটোপিরিয়ডিজম কি? আলোচনা করুন।
৪. পুষ্পায়নে নিম্ন তাপমাত্রার প্রভাব বর্ণনা করুন।
৫. ফল ও বীজ উৎপাদনকারী প্রভাবক গুলোর নাম লিখুন।
৬. ফাইটোহরমোন কি? একটি ফাইটোহরমোনের নাম লিখুন।
৭. ফল পাকলে মিষ্টি হয় কেন?
৮. সবুজ ফল পাকলে হলুদ, কমলা বা লাল বর্ণের হয় কেন - আলোচনা করুন।

খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. ফাইটোক্রোম কি? পুষ্পায়নের এর প্রভাব র্বণনা করুন।
২. উদাহরণসহ দিবালোকের দীর্ঘতা ভিত্তিক পুষ্পক উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ করুন।
৩. অক্জিন কি? এর শারীরতাত্ত্বিক প্রভাবগুলি বর্ণনা করুন।
৪. ফল পাকার শারীরতত্ত্ব বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১	ঃ	১। খ	২। খ	৩। ঘ	৪। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২	ঃ	১। ক	২। খ	৩। ক	৪। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩	ঃ	১। ক	২। ঘ	৩। গ	৪। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪	ঃ	১। ক	২। খ	৩। ঘ	৪। ঘ